৪ জানুয়ারি ২০১৫

দুঃশাসন, ভয়াবহ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথে এগিয়ে চলেছে দেশ: পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সদিচ্ছার অভাব ঘটলে পরিণতি ভয়ংকর হতে পারে।

অধিকার এর বিবৃতি

সাংবিধানিক বাধ্য বাধকতার অজুহাতে গত ৫ জানুয়ারি যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেই সংবিধান প্রধান বিরোধীদল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায় থেকে উত্থাপিত প্রতিবাদ ও আপত্তি উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নির্বাচনের আগেই বদলে দেয়। পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে এবং কমপক্ষে আরও দুইবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচনের জন্য আদালতের পরামর্শ উপেক্ষা করা হয়। সমালোচনা সত্ত্বেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু বিরোধীদলের সঙ্গে কোন আলোচনা অথবা জনগণের সম্মতি ছাড়াই একতরফাভাবে সংবিধান সংশোধন বাংলাদেশকে চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলে বিরোধী দল নির্বাচন বর্জন করে হরতাল-অবরোধ অব্যাহত রাখলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন, হত্যা, গুম ও গ্রেফতার চালায়। এছাড়া বিরোধী দলের ডাকা লাগাতার হরতাল ও অবরোধ চলাকালে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে এবং সাধারণ মানুষও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষমতাসীন থেকে ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী নির্বাচিত করে এনে মোট ৯ কোটি ১৯ লাখ ৪৮ হাজার ৮৬১ জন ভোটারের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লাখ ২৭ হাজার ৩৯ জন ভোটারের ভোটাধিকার প্রয়োগের সাংবিধানিক অধিকারকেও ক্ষুণ্ন করা হয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার নামে একটি বিতর্কিত সরকারের ক্ষমতায় থাকা দীর্ঘস্থায়ী হলে তা শুধু বাংলাদেশ নয় পুরো দক্ষিণ এশিয়াকে অস্থিতিশীল করে তুলবে।

অধিকার এই ক্ষেত্রে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির আগে সমস্ত পক্ষের সুবিবেচনা কামনা করছে। *অধিকার* দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ছাড়া বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল করার দিকে নেয়ার জন্য এই মুহূর্তে আর অন্য কোন নিয়মতান্ত্রিক উপায় নেই। ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দুর্নীতি এবং সেই সঙ্গে ভঙ্গুর, অস্থিতিশীল ও বিস্ফোরন্মুখ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে 'অর্থনৈতিক উন্নতি'র বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখিয়ে স্থিতিশীল করা অসম্ভব। এই নীতির অনুসরণ বাংলাদেশে রাজনৈতিক এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির জন্য এক ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

পাঁচই জানুয়ারি উপলক্ষ্যে অধিকারের পুরো বিবৃতিটি নীচে দেয়া হোল:

১. গত ৩০ জুন ২০১১ সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটায়। গত ৫ জানুয়ারি ২০১৪ বাংলাদেশে ১০ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে একতরফাভাবে আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসে। এই বিতর্কিত নির্বাচন প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ ১৮ দলীয় জোট (বর্তমানে ২০ দলীয় জোট) এবং গণতান্ত্রিক বামমোর্চাসহ দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল বর্জন করে। এতে করে

নির্বাচনের আগেই নজিরবিহীনভাবে সর্বমোট ৩শ' আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনেই সরকারি দল আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের সমর্থকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এরপর ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৪৭টি আসনে, যেখানে খুব অল্পসংখ্যক ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এদিকে ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার কারণে মোট ৯ কোটি ১৯ লাখ ৪৮ হাজার ৮৬১ জন ভোটারের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লাখ ২৭ হাজার ৩৯ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগের কোন সুযোগই পাননি।[১]

২. নির্বাচনের আগে সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে কমিশনার মনোনীত করে নির্বাচন কমিশনকে সরকারি আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। বিরোধীদলের সঙ্গে কোন রকম রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়াই ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিব উদ্দীন আহমেদ ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের তারিখ ঘোষণা করেন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকেই দেশব্যাপী ভয়াবহ সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে ও ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে থাকে। এছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গুম করাসহ হতাহতের ঘটনা ঘটে এবং নির্বাচন চলাকালে ও পরবর্তীতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলা করা হয়। ২৫ নভেম্বর ২০১৩ থেকে ১০ জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে দুর্বৃত্তদের ককটেল ও পেট্রোল বোমা হামলায় ২১ জন নিহত এবং ৬৫ জন আহত হন। তবে এই হতাহতের ঘটনায় সরকার এবং বিরোধীদল উভয়েই একে অপরকে দোষারোপ করে। তাছাড়া সারাদেশে নির্বাচন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে যৌথবাহিনীর 'বিশেষ অভিযান' চলাকালে অনেক সাধারণ মানুষ গণগ্রেফতারের শিকার হন বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়।

৩. এই নির্বাচনে ৪০.৫৬ ভাগ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বলে নির্বাচন কমিশন জানায়। কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকা ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা আরো অনেক কম শতাংশ ভোট পড়েছে বলে দাবি করে। ফেয়ার ইলেকশনস্ মনিটরিং এলায়েন্স (ফেমা) নির্বাচনের দিন বেলা ২ টা পর্যন্ত মাত্র ১০ ভাগ ভোটারের অংশগ্রহণের খবর দেয় ও দিনের শেষে ফেমা মাত্র ১৪ ভাগ ভোটারের ভোট দেয়ার কথা বলে।[২] অন্যদিকে ইংরেজী দৈনিক নিউএজ ১০ থেকে ১২ ভাগ এবং দি ডেইলি স্টার ২০ ভাগ ভোট পড়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করে।[৩]

৪. এই নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জোট সঙ্গী জাতীয় পার্টির বিরোধীদলে অবস্থান গ্রহণ এবং একই সঙ্গে সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ, যা সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল কাঠামোর ওপর প্রচণ্ড আঘাত এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই নির্বাচনের আগে সরকারি দল খুব দ্রুত সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এই নির্বাচনের পর একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলেছিলো। কিন্তু নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর সরকারি দলের নেতারা তাঁদের পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে সরে এসে বর্তমানে পাঁচ বছরের জন্য তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন বলে দাবি করছেন।

৫. গত ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচন দেশ ও জাতিকে গভীর সংকটে নিপতিত করেছে, যা গণতন্ত্রের পথকে কঠিন করে তুলেছে। জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া বিতর্কিত এই নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা

[১] দৈনিক মানবকণ্ঠ, ০৮/০১/২০১৪ এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন,

[২] নিউ এজ, ১০/০১/২০১৪

[৩] নিউ এজ, ০৭/০১/২০১৪ এবং দি ডেইলি স্টার, ০৬/০১/২০১৪

ক্ষমতাসীনদের হাতে মানবাধিকার লংঘনের ঝুঁকি অনেক বেশি বেড়েছে। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনা আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ ও বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলা ও নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলো অব্যাহতভাবে ঘটছে। বিভিন্ন প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সরকার সমর্থিত ছাত্র ও যুব সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও যুবলীগ রাজনীতিতে সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়নের মূল কেন্দ্রে অবস্থান করছে এবং বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত হয়ে পড়েছে। এরা পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এছাড়া সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে বিরোধীদলের সমাবেশ বন্ধ করে মত প্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার অধিকার ক্ষুণ্ন করছে। নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এখনও বলবৎ আছে এবং এই আইন দুটি মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচারে বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ আরোপ করে সরকার জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। টকশোগুলোতে সরকারের অন্যায়-অবিচারের সমালোচনাকারীদের অংশ নেয়ার ওপর এক ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সরকার জাতীয় প্রচার মাধ্যম বিটিভিসহ অন্যান্য ইলেকট্রোনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ২০ মাস ধরে কারগারে আটক করে রাখা হয়েছে এবং আমার দেশ পত্রিকার প্রকাশনা এবং দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান এর সম্প্রচার এখনও বন্ধ রয়েছে। এছাড়া ২০১৪ এর শেষে দৈনিক নিউ এজ পত্রিকা অফিসে পুলিশি অভিযানের চেষ্টা চালানো হয়েছে। বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংসদ সদস্যদের হাতে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া মানবাধিকার সংগঠনসহ বেসরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৪' নামে একটি আইনকেও মন্ত্রী পরিষদ চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। এই আইন মানবাধিকার সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে অতি মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত এবং বিশেষ করে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সংগঠিত হবার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার ব্যবস্থা করবে, যা বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক ঘোষণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

৬. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৮৯ জন নিহত এবং ৯,৪২৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এই সময় ১৭০ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[৪] এছাড়া একই সময়ে ৩৯ জনকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বছরের শেষ প্রান্তে এসে সরকার ও বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট আবারো মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। ফলে যে কোন সময় মারাত্মক রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এবং এর ফলে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা করছে *অধিকার*।

৭. ১৯৯০ সালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ এর নেতৃত্বাধীন স্বৈরাচারী সরকারের পতনের মধ্যে দিয়ে ৫, ৭ ও ৮ দলীয় জোটগুলোর যৌথ রূপরেখা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে একটি অন্তবর্তীকালিন সরকার গঠিত হয় এবং সেই সরকারের

[৪] এদের মধ্যে রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ২১টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর প্রধান দুই রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে পারস্পরিক চরম অনাস্থার কারণে ও বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে নির্বাচনকালীন 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয় এবং এই ব্যবস্থার অধীনে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ৩টি নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। অথচ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সুযোগকে ব্যবহার করে এবং প্রধান বিরোধীদল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলসহ নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার কর্মী ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায় থেকে উত্থাপিত প্রতিবাদ ও আপত্তি উপেক্ষা করে কোন গণভোট ছাড়াই ২০১১ সালের ৩০ জুন সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী বিলটি পাশ করে এবং তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি মরহুম জিল্লুর রহমান ২০১১ সালের ৩ জুলাই এই বিলটিতে সম্মতি দেয়ায় তা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। গত ১৫ মে ২০১১ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করার পরও আগামী দুটো নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়ার ব্যাপারে মত দেয়, কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে তারও আর কোন সুযোগ থাকেনি।

৮. *অধিকার* দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার এই সংকট ও এতে করে সৃষ্ট ব্যাপক আস্থাহীনতায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। *অধিকার* মনে করে, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া বাতিল করে দেশকে এক চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি নির্দলীয় সরকার এখনও প্রয়োজন। এদেশের জনগণ এখনও একটি নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থার অধীনে মুক্তভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চর্চা করতে আগ্রহী। *অধিকার* আশা করে, একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অবিলম্বে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে বাংলাদেশের জনগণ সক্ষম হবেন।

একাত্মতা প্রকাশে,

অধিকার টিম